The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 105 - 116)
Published in November 2024

আলমগীর কবিরের *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

ড. মোঃ মোরশেদুল আলম *

প্রতিপাদ্যসার: ইতিহাসের সাথে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, ঘনিষ্ঠ ও সুগভীর। ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান হিসেবে চলচ্চিত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার সংগ্রাহক ও সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। চলচ্চিত্র কেবল নির্মাণ ও প্রদর্শনের বিষয় নয়; এর শৈল্পিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জনসংস্কৃতির দিকও রয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ তাঁদের চলচ্চিত্রে যে কাহিনি বর্ণনা করেন বা যে বক্তব্য তুলে ধরেন; তা একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়। চলচ্চিত্রে একটি জাতির যে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় আত্মপরিচয় প্রতিফলিত হয়; তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বৈশ্বিক মঞ্চে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস, গৌরব ও ঐতিহ্যের পরিচয় বর্ণনা করে। বাঙালির জীবনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা বৈপ্লবিক যুগান্তরের সম্ভাবনাময়, তাৎপর্যবহ ও সুদূরপ্রসারী। ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসন-বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনের অনিঃশেষ চেতনা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মতো শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের এ গৌরবময় চেতনা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সৃজনপ্রেরণা, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশবিভাগোত্তর সময় থেকেই ক্রমাগ্রসরমান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাঝে রাজনৈতিক চিন্তার যে প্রকাশ, এদেশের নবতর মাধ্যম হিসেবে নিশ্চিতরূপে চলচ্চিত্রও তার অংশীদার। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পে এক নতুন ধারার জন্ম দেয়। মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই নবতর ধারা ছিল স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে নির্মিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেমণ্ডিত। বর্তমান প্রবন্ধে আলমগীর কবির পরিচালিত *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিবিধ প্রসঙ্গ উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।]

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এদেশবাসীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যে বিরুদ্ধতার সূত্রপাত হয়, তা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের মাধ্যমে সে সার্বিক বিরুদ্ধতার চূড়ান্ত ও পরিণত ফললাভ সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের এ বিজয় অর্জন বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন এবং ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য ঢাকা সেনানিবাসে তৈরি করা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক নীলনকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও গণহত্যা চালায়। এ বর্বরোচিত হামলাকে প্রতিহত করার জন্য

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলে, যার নাম ৭১- এর মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিনিময়ে বাঙালি জাতি এ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি অর্জন করে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে রূপান্তর ঘটে, বাঙালির সৃষ্টিশীল চেতনার গুণগত বিকাশের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাঙালির শিল্পধারায় এক নবলব্ধ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরবাহী। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও চিত্রকলার পাশাপাশি চলচ্চিত্রও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা অবলম্বনপূর্বক সৃষ্টিশীল প্রেরণার অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েছিল। এ জাতীয় চৈতন্যের পটভূমি এবং বাঙালির আত্মত্যাগের কাহিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে প্রোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে এক নতুন চলচ্চিত্রশিল্পের জন্ম-সম্ভাবনা বাস্তব হতে চলেছে। যুদ্ধ চলাকালীন সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্রকারদেরও মানসচেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তঝরা যাতনার এবং লাঞ্ছনার যে ঘটনাবলি, তার তুলনামূল্য হিটলারের নাজি বাহিনীকেও ছাপিয়ে গেছে। আপামর জনসাধারণের মরণপণের ইতিহাস আমাদের দেশের মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে গ্রথিত হয়েছে– সে অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র অন্যতম। স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস দৃশ্যায়নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলে একইসাথে ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিনোদন পাওয়া যায়। মুক্তিসংগ্রামের ভয়াল সময়ের চিত্র গ্রন্থপাঠে যতটা উপলব্ধি সম্ভব, তার অধিক প্রতিফলিত করা সম্ভব চলচ্চিত্র মাধ্যমে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা উপলব্ধি এবং চলচ্চিত্রশিল্প মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণে কতটা ভূমিকা রেখেছে এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমান প্রবন্ধে আলমগীর কবিরের নির্মিত *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিবিধ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে: ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং খ) বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি। প্রথমত ইতিহাস অনুসন্ধান এবং একটি তথ্যগত ভিত্তি নির্মাণে ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং চলচ্চিত্রের স্বরূপ উদঘাটনে চলচ্চিত্রটিকে ন্যারেটিভ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিচার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এ পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াজাত করে আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনামূলক ও মূল্যায়নধর্মী পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রবন্ধ রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধ রচনার লক্ষ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১। চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা পর্যালোচনা করা।

২। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে যে চেতনা কাজ করেছিল চলচ্চিত্রমাধ্যমে তা কীভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা।

৩। চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত সমকালীন আলোচনা, সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা।

৪। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র হিসেবে *ধীরে বহে মেঘনা*-এর বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করা।

৫। চলচ্চিত্রবিষয়ক গবেষণায় দেশের তরুণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের অনুপ্রাণিত করা।

৬। দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতিগঠনে অবদান রাখা।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেই এক নতুন ধারার চলচ্চিত্রের পথচলা শুরু। স্বাধীনতার পর সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ এবং আরো পরে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ধারণ করে বাংলাদেশে এ নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু (হোসেন ৩০)। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের ইতিহাস বস্তুত এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে সংগ্রাম তার সমান্তরাল। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই যাত্রা শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *ধীরে বহে মেঘনা* ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায়। এটি স্বকীয় চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলী, আধুনিক জীবনবোধ, সমকাল, স্বদেশ আর বাস্তব জীবনের নবতর উপস্থাপনায় ঋদ্ধ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবির পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র (Kabir, 'ধীরে বহে মেঘনা' 71)। চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায়। প্রথমে এ চলচ্চিত্রের নাম ছিল 'এবং ধীরে বহে মেঘনা'। 'এবং' শব্দটি পরবর্তী সময়ে বাদ দেয়া হয়। জহির রায়হান ছিলেন এ ছবির মূল পরিকল্পনাকারী। ছবিটি পরিচালনা করার কথা ছিল জহির রায়হানের। তাঁর পরিচালনায় ছবিটির রূপ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আলাদা হতো। কিন্তু তিনি জীবদ্দশায় এটি নির্মাণ করতে পারেননি (হায়াৎ ৭৬)। চলচ্চিত্রটির নির্মাতা আলমগীর কবির বলেন, পরিচালকের ভূমিকায় আমার মুখ্যত দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল (আতিকুজ্জামান ৩৭)। *ধীরে বহে মেঘনা* পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধনির্ভর একটি সার্থক চলচ্চিত্র। শুধুমাত্র বিষয়ের কারণেই নয়, আঙ্গিকের কারণেও এটি আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। 'British Film Institute' প্রণীত এ যাতবকালে বাংলাদেশে নির্মিত শীর্ষ ১০টি ছবির একটি তালিকা (Top 10 Films of Bangladesh) এক সময় তাদের ওয়েব সাইটে পাওয়া যেত (আলম ৩৩৬)।

1. *Titash Ekti Nadir Naam*	Ritwik Ghatak	1973
2. *Chitra Nodir Pare*	Tanvir Mokammel	1999
3. *Nodir Naam Madhumati*	Tanvir Mokkamel	1994
4. *Shimana Perye*	Alamgir Kabir	1977
5. *Bader Meye Josna*	Tojammel H Bokul	1989
6. *Surja Dighal Bari*	Shaik Niamat Ali & Masihuudin Shaker	1979
7. *Dhire Bohe Meghna*	Alamgir Kabir	1973
8. *Rupali Shaikate*	Alamgir Kabir	1979
9. *Srabon Megher Din*	Humayn Ahmed	1999
10. *Sat Bhai Chompa*	Dilip Shom	1968

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির টানাপোড়নের চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পটভৌমিক পরিমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্রে নিবিড়ভাবে ওঠে এসেছে সদ্যস্বাধীন দেশে মধ্যবিত্ত নাগরিকদের যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবনযাপন ও আত্মত্যাগের করুণতম চিত্র। নির্মাতা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চলচ্চিত্রে উপস্থাপনের জরুরি প্রয়োজন বলে অনুভব করেছিলেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে সংযোগ ও মননের সমন্বয় ক্ষণকালের জন্য হলেও ঘটেছিল সে সংবাদটি পরবর্তীকালের উভয় দেশের নবপ্রজন্মের নিকট আলোকিত করা (ইসলাম ১৫৭)। *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে নির্মাতা আলমগীর কবির বলেন,

> যা আমার কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক তা তথাকথিত উচ্চশ্রেণিভুক্ত লোকের মনোভাব। বাংলাদেশের ছবি এখনও অবিভক্ত বাংলার ছবির যুগেই থেকে গেছে। যতক্ষণ না অত্যন্ত সরলভাবে শরৎচন্দ্রের গপ্পোকেন্দ্রিক ধরনের ছবির কাঠামো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ আপাতশিক্ষিত দর্শকসমাজ অত্যন্ত অনুৎসাহী বোধ করে। তার পরিবর্তে আমি কল্পমূর্তির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশের আহত ক্ষতকে, আর শত বাধা সত্ত্বেও তার বাঁচার শক্তিকে। অম্ল-মিষ্টি স্মৃতির মধ্যে স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে নতুন দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং ভারত-বাংলার গণমানুষের বন্ধুত্বের টুকরো টুকরো অনুক্রম নিয়ে গড়ে উঠেছিল এ চিত্রনাট্য। চরিত্রগুলোকে হিন্দু-মুসলমান তৈরি না করে যতখানি সম্ভব মানবিক ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়েছিল (সাহা ৫৯-৬০)।

বাংলাদেশের রাজনীতি বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিষয়ও এতে স্থান পেয়েছে এই চলচ্চিত্রে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদানের চিত্র এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ছিল এ চলচ্চিত্রের প্রধান দিক (আতিকুজ্জামান ৩৭)। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ ছিল একটি নিরীক্ষাধর্মী ও মেধাদীপ্ত প্রয়াস। তবে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধদৃশ্যের চিত্রায়ণ এতে তেমন গুরুত্ব পায়নি (হাসান ১৬৬)। আলমগীর কবির-এর মতে, উদ্ভট কাল্পনিক ঘটনার আশ্রয়ে নির্মাণ না করে *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা কিন্তু গল্পের গাঁথুনিতে উল্লিখিত হয়নি। শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাস্তব মানুষের রূপায়ণকে চলচ্চিত্রটিতে আলাদা করে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়াস রয়েছে। *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক নবতর আধুনিক প্রয়াস। এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব ও প্রমাণ্য ঘটনার সাথে কল্পিত চরিত্রের সংমিশ্রণে 'সিনেমা ভেরিতে' রীতিতে। আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র নির্মাণের 'ডিরেক্ট সিনেমা' পদ্ধতির প্রয়োগ, এটিও চলচ্চিত্রের একটি সাহসী রাজনীতি সচেতন শৈলী (দাশগুপ্ত ৫৪০)। দেশের বা সমাজের নানা সঙ্গতি-অসঙ্গতি, দুঃখ-দুর্দশা ও জীবন-সংগ্রামের যে সকল চিত্র তাঁর চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়; তা তিনি সবসময় বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এজন্যই চলচ্চিত্রের সবচেয়ে জোরালো ও বাস্তবধর্মী শৈলীটিকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে এই শৈলী যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাঁর মধ্যে জারিত হয়েছিল।

আলমগীর কবিরের *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রে আশাবাদী আকাঙ্ক্ষার ঢেউ দোলায়িত হয়েছে মেঘনার প্রবহমানতায়। যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন আছে এখানে মানুষের স্মৃতিতে তবু তারা বেঁচে আছে এই বর্তমানে, যুদ্ধোত্তর নতুন দেশে– নতুন গন্তব্যে পৌঁছুবার আকাঙ্ক্ষায়। কারো বা প্রিয়জন, প্রিয়তমা আর স্বজন হারানোর বেদনায় বর্তমান অস্তিত্বের অঙ্গহানী বা অসম্পূর্ণতা আছে এই ছবির প্রায় সকল চরিত্রেরই। ভারতের অনিতা হারিয়েছে প্রদীপকে, আর বাংলাদেশের সুমিত বয়ে বেড়ায় প্রিয়তমা হাসুর পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক ধর্ষিত হবার নির্মম স্মৃতি। বোন নাজমারও রয়েছে সদ্য বিবাহিত জীবনে হানাদারদের হাতে স্বামী রফিকের হত্যা দৃশ্য অবলোকনের একক নির্মম অতীত। অনিতা, হাসু, নাজমা, সুমিত, মানবেন্দ্র সকলেই যেন যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের রেখে যাওয়া এক একটি জীবন্ত ফসিল। ছবিটির ঘটনাকাল দেখানো হয়েছে ১৯৭২ সাল, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ। যুদ্ধ শেষ, তবু যুদ্ধ স্মৃতি তাড়িত চরিত্রগুলো বার বারই ফিরে গেছে যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে কখনও ভয়েস ওভার, কখনও যুদ্ধকালীন সময়ে ধারণ করা প্রামাণ্যচিত্রের রাশফুটেজ দর্শনের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও ফ্ল্যাশব্যাকের মুহুর্মুহু প্রয়োগে। সমালোচকের ভাষায় 'Internal Flash Back'-এর যথাযথ ব্যবহারে তিনি ভেঙ্গেছেন বর্ণনাধর্মীতার একঘেঁয়েমি; তবে যুদ্ধে পোড় খাওয়া এই মানুষগুলো শুধু যে এই ফ্ল্যাশব্যাক সমেত স্মৃতি কাতরতায় বর্তমানে হাজির তা নয়। এরা সকলেই যাপিত জীবনের ক্রমাগ্রসরতায় যে যার কাজের মধ্য দিয়ে ফিরে যায় অতীতে।

সেই অতীত আবার বর্তমানের গভীরে প্রোথিত। অথবা বলা যায়, এদের অসম্পূর্ণ বর্তমান সেই অতীতেরই বিকলাঙ্গ সমীকরণ (আক্তার ৭৩)।

ফ্ল্যাশব্যাকে মূর্ত হয়েছে রক্তাক্ত যুদ্ধ, ত্যাগ ও গণহত্যার লাশের ছবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয়দের সহায়তা এবং যুদ্ধোত্তর পরিবেশে বিক্ষুব্ধ তারুণ্যের চিত্র ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড কৌশলে চিত্রায়িত হয়েছে (হায়াৎ, *মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র* ৭৭)। পরিচালক চলচ্চিত্রটির বাস্তবসম্মত আবহ ও পরিবেশে চরিত্রগুলোকে অন্তর্লীন করে স্থাপন করেছেন যা *ধীরে বহে মেঘনা*'র চলচ্চৈত্রিক নির্মিতির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশকে উপস্থাপনায় বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন, যুদ্ধের প্রস্তুতি, গণহত্যা, মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং বিজয় প্রভৃতি নানাবিধ মৌল বা প্রধান আখ্যান থেকে পরিচালক স্বচ্ছন্দে প্রামাণ্যচিত্রে চলে গেছেন। তিনি Internal flash back-এর যথাযথ ব্যবহার করে বর্ণনাধর্মীতার প্রচলিত একঘেয়েমিতাকে ভেঙে ফেলেছেন। তাছাড়া mise-en-scene-এর সুপরিকল্পিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অনুঘটকের মত তাঁর ক্যামেরার লেন্স কাজ করেছে (ইসলাম ১৫৯)। এ চলচ্চিত্রের প্রশংসায় তানভীর মোকাম্মেল বলেন, 'যুদ্ধকালীন জনগণের জীবনের আতঙ্কবোধ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বা যুদ্ধ কিভাবে মানবিক সম্পর্কগুলোকে বিপর্যস্ত করে, তার কিছু নিপুণ চিত্রায়ণ আছে ছবিটিতে। জীবনের প্রথম ছবি হিসেবে *ধীরে বহে মেঘনা* নিঃসন্দেহে আলমগীর কবিরের প্রশংসনীয় সৃষ্টি এবং আমাদের চলচ্চিত্রের একটি মাইলস্টোন।' আলমগীর কবির তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র *ধীরে বহে মেঘনা*'য় (১৯৭৩) যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের বর্তমান আর বর্তমানের প্রবহমানতা ভেঙে অসংখ্য flashback প্রয়োগ করেন মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের নানামুখী অতীত অঙ্কনের প্রয়াসে। বর্তমান আর অতীতের এই মুহুর্মুহু আন্তঃযোগাযোগ যেন ইতিহাসের এক কালপর্ব নির্মাণের তাগিদ থেকে উৎসারিত। এভাবে নির্মাতা এই চলচ্চিত্রে 'সময়'-এর বর্তমান থেকে অতীতে, আবার অতীত থেকে বর্তমানে ভ্রমণের মাধ্যমে সময়ের ধারাবাহিকতা বা 'Continuity' ভেঙ্গেছেন। একই সাথে, মুক্তিযুদ্ধকালীন ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের একটি সামগ্রিক চিত্রের 'Organic Unity' ও তৈরি হয় এই চলচ্চিত্রে (কবির, *ধীরে বহে মেঘনা* ৪০)।

ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া 'কত যে ধীরে বহে মেঘনা / শান্ত তবু সুপ্ত সে নয় / কাজল জলের অতল তলে / দোলায় আশা, জাগে হৃদয়। সবুজ স্নিগ্ধ তীরে ভীরু মমতায় / গঞ্জ-গ্রামের নীড় নিবিড় জড়ায়, ফসলের সোনা স্বপ্নিল সম্ভার / দিয়ে যায় জীবনের অধিকার, দুঃখের ছায়া ঘনাক তবু / প্রাণের পটে আঁকা প্রণয়।/ হঠাৎ ক্ষিপ্ত নদী ক্রোধে ছেঁড়ে পাল, ঝঞ্ঝা-ঝড়ের বেগ প্রবল মাতাল, চিরদিন জানি : সংসার সংগ্রাম, প্রতিরোধ, প্রতিকার লেখে নাম।/ বিপদ বাধা আঘাত যত / তুচ্ছ করে আসে বিজয়' গানটি পরিবেশিত হয়। গানটির কথা লিখেছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং সুর দিয়েছিলেন সমর দাস। এছাড়াও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া '(ওরে আয় ঘরে আয় / ওরে আয় ঘরে আয়) সাগর ভেঙে বন্যার বেগে আয় / আকাশ ভেঙে ঝঞ্ঝার বেগে আয় / সূর্যোদয়ের এই প্রহরে / মুক্তিপাগল ওরে আয় ঘরে / দুর্বার সংগ্রাম দুর্জয় নাম / আঁকে যে ঐ পতাকায়। সোনাভরা প্রান্তর কত শত গ্রাম / ধ্বংসের বারুদে জ্বলেছে / জনপদ বন্দর গৃহ অবিরাম / হানাদার পশুরা দলেছে / তবু জীবন এই পোড়া মাটিতেই / বারে বারে ডেকে যায়। অমারাতি অশ্রুর জানি অবশেষ / সূর্যের শিখা ঐ যে পথে / শহীদের রক্তের ঋণে গড়া দেশ / সাজবেই নতুনের শপথে / বিজয় আলোর সেই নব পরশেই / চলো ছুটে মোহনায়।' গানটি পরিবেশিত হয়। এ গানটির কথা লিখেছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং কণ্ঠ দিয়েছিলেন সমর দাস (আহসান ২০৫-২০৬)।

ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের একদম প্রান্তিক বিষয়, প্রতিবেশী দেশের সাধারণ মানুষ, সেনাবাহিনী বা বিমানবাহিনীর লোক, যাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি, অবদান, আত্মত্যাগের গল্প। তাঁদের 'দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখা' এ ছবিতে এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ভারতের অনেক তরুণ এ দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এরই প্রাসঙ্গিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে ভারতীয় ছাত্রী অনিতার প্রেমিক ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাইলট প্রদীপ নিহত হন। প্রদীপের মৃত্যুর পর সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে অনিতা ছুটে আসে স্মৃতি তাড়িত হয়ে। সে বুঝতে চায়– এ দেশের জন্য কিসের এত দায় ছিল প্রদীপের? কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক এদেশে পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের পর তার ভুল ভাঙে। চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে এ প্রসঙ্গে অনিতা বলে, 'সারা ভারত, বাংলাদেশ যখন জয়ের আনন্দে মত্ত তখন আমি নিজেকে ঘৃণা করেছি, বাংলাদেশকে ঘৃণা করেছি। আমার চোখেও ঘুম ছিল না। থাকতে না পেরে চলে এসেছি এখানে। দেখতে বুঝতে বাংলাদেশ কী এমন জিনিস যার জন্যে চিরদিন দগ্ধে দগ্ধে মরতে হবে। আজ মেঘনার বুকে ভাসতে ভাসতে যেন আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম এমন দেশের মুক্তির জন্য যে কোনো মূল্য দেয়া যায়' (*ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রের ডিভিডি থেকে সংগৃহীত)।

এখানে এসে অনিতা তার মায়ের বান্ধবী এবং তার মেয়ে নাজমা ও পুত্র সুমিতের সাথে পরিচিত হয়। সুমিত পেশায় একজন সাংবাদিক। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং তাদের দোসরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখে এবং কাহিনি শুনে অনিতা ভীষণ আবেগ তাড়িত হয়। তার হৃদয় গভীর মানবিকতা বোধে আচ্ছন্ন হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ থেকে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে সে তার দেশ ভারতে ফিরে যায়। *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে সমালোচক আপন চৌধুরী বলেন, *ধীরে বহে মেঘনা*'র শেষ দৃশ্যের শটগুলোতে দেখানো হয় লং শটে ইন্ডিয়ান ইয়ার লাইন্সের বোয়িং বিমান অনিতাকে নিয়ে আকাশে উড়লো। ঢাকার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসার প্রস্তুতি চলছে। বুড়িগঙ্গার ওপারে সূর্যাস্তের আভা। ঘিঞ্জি পুরানো ঢাকার একফালি আকাশ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। রাস্তার ধারে হাপরের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। আর বুড়িগঙ্গার জলে অস্তমিত সূর্যের প্রতিবিম্ব জ্বলছে ঝিকমিক। চমৎকার কয়েকটি ইমেজ নতুন আশাবাদের জন্ম দেয়। এটি ঢাকায় নির্মিত অন্যান্য ছবির চাইতে উন্নতমানের। অন্যান্য ছবির নির্মাণ পদ্ধতি যাত্রাধর্মী হওয়ায় চলচ্চৈত্রিক উপাদান নির্ভর ছবিটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শিল্পোত্তীর্ণ অধিকাংশই auteur (ওতর) রীতির অর্থাৎ চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত সর্ববিধ মতবাদ বিধৃত। ফলে আদিযুগ থেকে fiction এবং non-fiction চলচ্চিত্রের সৃজনরীতিতে যে আপাত পার্থক্য নির্দেশিত হয়ে আসছে তা উত্তরোত্তর অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে (আতিকুজ্জামান ১১৯)। দু'ধরনের চলচ্চিত্রই চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত মানসের, মতবাদের ধারক ও বাহক। কেবল দৃশ্য সংগ্রহের রীতিটা আলাদা। উভয় কর্মেই realism, naturalism এবং ইচ্ছাকৃত construction কমবেশি বিদ্যমান। কাজেই সব চলচ্চিত্রই মূলত একাধারে fiction এবং non-fiction অর্থাৎ Complete Cinema (কবির, 'ধীরে বহে মেঘনা' চ)। *ধীরে বহে মেঘনা* এই উপলব্ধিরই প্রথম প্রচেষ্টা। এর অধিকাংশ ঘটনা সত্য এবং সমকালীন রূঢ় বাস্তব থেকে সংগ্রহ করা। সেই recreated reality-র সাথে সমন্বিত হয়েছে সমকালীন প্রামাণ্য চিত্র যা কোনো স্টক শট নয়। গল্পের কাঠামোটি constructed (হায়াৎ ১০৪)। আলমগীর কবির পেশায় একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি নিজে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাই তাঁর নির্মিত *ধীরে বহে মেঘনা* যেন সে সাংবাদিক এবং মুক্তিযোদ্ধারই চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও মানসিক বিপর্যয়কে তিনি প্রামাণ্য ও কল্পনার মাধ্যমে এ চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করেছেন। ছবিটি প্রামাণ্য বা

তথ্যচিত্রের আঙ্গিকে উপস্থাপিত। আবহমান বাংলার প্রবাহমান জীবন চেতনার অনুভবের কোনো ভাষ্য নয়, সমকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের কয়েকটি মানুষের খণ্ডিত জীবন মুহূর্তের উদ্ধৃতি মাত্র। নামকরণ অন্য কিছু হলে ক্ষতি ছিল না। *ধীরে বহে মেঘনা*র ব্যাপকতা আর গভীরতার মর্মমূলে প্রবেশ অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এ কথা টাইটেলেও ব্যক্ত। *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* দিয়ে দেশীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ পদ্ধতিতে আধুনিক এবং ব্যতিক্রমী প্রয়াসের সূচনা আর *ধীরে বহে মেঘনা* সেই আঙ্গিক প্রকরণে সৃষ্ট বলিষ্ঠ সংযোজন।

চলচ্চিত্রটির নির্মাণশৈলীতে একজন আধুনিক নির্মাতার ছাপ লক্ষণীয়। তবে এটি প্রামাণ্যচিত্রের ঢং-এ নির্মিত বলে জনসংযোগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হলেও এতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ তিতিক্ষার চেয়েও যুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় জওয়ানদের ভূমিকাই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে (কাদের ২৩০)। চলচ্চিত্রটি প্রচারধর্মী প্রবণতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত তা বলা যাবে না। কারণ পরিচালকের নিজস্ব চিন্তা-দর্শনের পক্ষে সংলাপের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় তাঁর সচেতন প্রয়াস অনেক সময়ই প্রচ্ছন্ন থাকেনি (আতিকুজ্জামান ২০২)। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দু'দেশের সম্পর্কের দৃঢ়তা বাড়ানোর যথার্থতা প্রতিপন্ন করাই ছিল চলচ্চিত্রটির অন্যতম প্রচারণা লক্ষ্য যা সাধারণ দর্শকও বুঝতে সক্ষম। প্রচারণা প্রবণতার কারণে আরোপিত বলে প্রতীয়মান হলে মহৎ কর্মেরও শিল্প সৌন্দর্য কমে যায়। এ সকল বিষয় বিবেচনা করলে চলচ্চিত্রটি যে ত্রুটিহীন নয় তা অনুধাবন করা যায় (হাসান ১৬৬)। চলচ্চিত্রটি নির্মাণে বিবিধ প্রতিবন্ধকতার কথা পরিচালক আলমগীর কবির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'বিবিধ কারণে আমাকে চিত্রনাট্য বদলাতে হয়েছে, অনেক দিক বাদ দিতে হয়েছে।...কারণ, স্টুডিওর পূর্ণ সুবিধা পাইনি বলে ছবিটাকে পুরোপুরি সিনেমাটিক করতে পারিনি এবং আরো অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু বলতে পারিনি।...তবে আমার পরম শত্রুও নিশ্চয় আমাকে এ বলে দোষারোপ করতে পারবেন না যে বাজারি মনোবৃত্তি নিয়ে আমি ছবিটি করেছি (আতিকুজ্জামান ৩৭-৩৮)।' *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রের সমালোচনায় চিন্ময় মুৎসুদ্দী বলেন, 'এ ছবি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন নির্মাতা। এটি বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রয়াস। এখানে এই দুই দেশের 'বন্ধুত্বের' ওপর জোর দেয়া হয়েছে। রোমান্টিকতার আমেজে ভাবাবেগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বৈমানিকের মৃত্যুকে আত্মত্যাগ হিসেবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এভাবে বিকৃত করা হয়েছে এ ছবিতে। আলমগীর কবিরের কাছে এ দেশের তরুণদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ যেন কোন বিষয় নয় (মুৎসুদ্দী ৬২-৬৩)।' তবুও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটি এক ভিন্নধর্মী প্রকরণ বা সেলুলয়েডিক স্টাইল। এই প্রামাণ্যের শরীরে টুকরো টুকরো ইমেজ-এর যোজনে গড়ে ওঠে ফিকশানের একটি পূর্ণাঙ্গ অর্গানিক কাঠামো। সামগ্রিক অর্থেই, *ধীরে বহে মেঘনা* Creative fiction of actuality– প্রামাণ্য আর কাহিনিচিত্রের এক অদ্বৈত অথচ নবতর চলচ্চৈত্রিক ভাষা (আক্তার ৮৯)।

ধীরে বহে মেঘনা যে এদেশের এলিট শ্রেণি তেমন পছন্দ করেনি, তার কারণ শুধুই এদেশের এলিটদের সাধারণ ফিলিস্টিনিজম এবং চলচ্চিত্রবোধ তথা সংস্কৃতিবোধের অভাব নয়, আরও গভীর একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণও এর পেছনে কাজ করেছে, তা হচ্ছে–সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা। যে সহজ সাবলীলতায় আলমগীর কবির হিন্দু-মুসলমান এ দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পর্ক গড়েছেন, তা এ এলিট শ্রেণির প্রিয় ছিল না (আতিকুজ্জামান ৪৮)। সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে '৪৭-এর দেশভাগ, যার কল্যাণে আজ তাদের বাড়ি-গাড়ি-বিদেশভ্রমণ-বিলাসব্যসন, ফলে পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ প্রসার করবে যে চলচ্চিত্র, সাম্প্রদায়িক মানসিকতার গোড়ায় আঘাত হানতে চাইবে যে শিল্পকর্ম, তা তাদের প্রিয় না হওয়ারই কথা। শুধুমাত্র চলচ্চিত্রিক ফর্মটাই হয়তো

এক্ষেত্রে একমাত্র অন্তরায় ছিল না (সাহা ৬০)। বাংলাদেশের দর্শক সমাজ এমনকি বুদ্ধিজীবী সমাজের নিকটও *ধীরে বহে মেঘনা* সমাদৃত হয়নি। কারো মতে এটি একটি অক্ষম চলচ্চিত্র, আবার কারো মতে এটি যেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয়দের দানের স্বীকারোক্তি (আহমেদ ১৯৪)। এ চলচ্চিত্রের সমালোচনায় পরিচালক আলমগীর কবির বলেন,

> The presentation style was a way off the established track. Instead of a story with neat beginning, middle and end what I eventually succeeded in presenting was a cinematic collage of some recreated real-life episodes that occurred during 1971 Liberation War. I also made extensive use of documentary material on war, genocide and destruction that I had shot myself during the war despite the trade's reservation against documentary footage in drama film. I tried to introduce some cinematic naturalism in acting style also. I used two songs not as usual relief interludes but as integral parts in the emotional development of the narrative. Today as I see the film I find too many flaws in it, particularly in cutting and in treatment. However, from this film I have learnt an important lesson in practical film directing and that is: never change your story line-up during shooting. Various political factors have been responsible for the film's cool reception by the critics as well as by the then government. However, it is my firm belief that one day when some temporary emotions will have died down this film, despite its technical weaknesses, might be recognised as an important filmic document on anti-communalism and progressive internationalism (Kabir 71-72).

ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের পটভূমিতে দেখি মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ সদ্য সমাপ্ত হওয়া যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন কাটিয়ে উঠেনি তখনও। এই চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলো বার বারই ফিরে গেছে যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে কখনও আত্মকথনে, কখনও যুদ্ধকালীন প্রামাণ্যচিত্রের রাশফুটেজ অবলোকনের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকের পাখায় বর করে। চলচ্চিত্র বস্তুত একটি নির্মাণ। এই নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনটি উপাদান প্রধান: দৃশ্যখণ্ড, শব্দখণ্ড ও সম্পাদনাকর্ম। এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়েই চলচ্চিত্রের সাংগঠনিক কাঠামোটি অবয়ব প্রাপ্ত হয় (আউয়াল ১৪৩)। *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও নির্মাতা মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রামাণ্য ফুটেজ আর কাহিনি ছবির কল্পিত কথনের মিশেলে তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির সামগ্রিক অবয়ব গড়েন ইতিহাসের চলচ্চিত্রিক ভাষ্য নির্মাণের অভিপ্রায়ে। এখানে প্রামাণ্য এসেছে রিপোর্ট, আর ফাউন্ড ফুটেজের সত্যকথনের মিশেলে। কল্পিত কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে প্রামাণ্যের যোজনে গড়ে উঠেছে এই চলচ্চিত্রের পূর্ণাঙ্গ ও অর্গানিক কাঠামো। আধুনিক করণ কৌশলের প্রয়োগ আর পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনা সত্ত্বেও এটি ব্যবসা সফল হয়নি। সমকালীন বাণিজ্যিক ছবির রীতি-পদ্ধতি কিংবা গড়পড়তা দর্শক রুচিকে তুষ্ট করার অভিপ্রায় নির্মাতার ছিলনা। একই সাথে তিনি বুঝতেন না ছবিকে ব্যবসা সফল করার এতদ্ দেশীয় কৌশল। প্রথম ছবির ব্যবসা অসফলতা কিংবা সমালোচকের চাবুকাঘাতে কবির কিছুটা হতাশ হলেও দমে যাননি। আপোষও করেননি প্রচলিত বাণিজিক ছবির গৎবাঁধা গঠনের কাছে। আবারও তীব্র আত্মপ্রত্যয়ে অঁথর পরিচালকের স্বভাবেই নিজের গল্প ও চিত্রনাট্যে স্ফুরণের পথে নির্মাতা অগ্রসর হন (আক্তার ৫৩-৫৪)। *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটি এক ধরনের ডকুমেন্টারি। এর প্রত্যেকটি ঘটনা সত্যি, যদিও কিছু কিছু সংলাপ পরিচালকের স্বলিখিত। অনিতাকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কিছু প্রামাণ্যচিত্রের রাশ দেখানোর সিচুয়েশন তৈরি এবং সে রাশ দেখানোর মাঝে সুমিতের ন্যারেশনে

'৭১-এর ভয়াবহ কিছু ছবি যেমন: চোখবাঁধা অবস্থায় নিহত বুদ্ধিজীবী, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, সম্পূর্ণ সিকোয়েন্সটি নিঃসন্দেহে সিনেমা ভেরিতের বুদ্ধিদীপ্ত এক ব্যবহার।

চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে রহিমুল্লাহর এক প্রশ্নের জবাবে সুমিতকে আমরা বলতে দেখি, 'দেখুন, দেশপ্রেম শব্দটা বড় গোলমেলে। এরই নামে ইয়াহিয়া খান এদেশের ত্রিশ লক্ষ পুরুষ, মহিলা আর শিশুকে হত্যা করেছে। এরই নামে দালালরা বিহারিদের উত্তেজিত করেছে বাঙালিদের হত্যা করতে। আবার এরই জন্যে লক্ষ লক্ষ বীর বাঙালি অস্ত্র তুলে নিয়েছে এবং জীবন দিয়ে দেশকে মুক্ত করেছে।' রহিমুল্লাহর আরেকটি প্রশ্নের জবাবে সুমিত বলেন,

> ...বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস কেবলমাত্র দু'এক বছর বা দু'এক দশকের ইতিহাস নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষ বিদেশি এবং দেশি শোষকদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে শোষণের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সত্যি কথা বলতে কি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ সত্যিকারের জয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এর পরের লক্ষ্য একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। এরই মধ্য দিয়ে বাঙালিকে অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে বিশ্বের লক্ষকোটি নিপীড়িত মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, বর্ণ-বৈষম্যবিরোধী এবং শোষণ বিরোধী সংগ্রামে। (*ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রের ডিভিডি থেকে সংগৃহীত)।

সুমিতের বর্ণনার প্রেক্ষিতে পরিচালক প্রামাণ্যচিত্রে দেখিয়ে যান: মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং, গণহত্যা, পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, যৌথ কনভয়ের অগ্রগতি, বিধ্বস্ত জনপদ, ব্রিজ, রেলগাড়ি, দালানকোঠা; মুক্ত যশোরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা, মুজিবনগর সরকারের ঢাকা প্রত্যাবর্তন, মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সাথে স্থানীয় মানুষের করমর্দন; নেপথ্যে সংগীত 'সাগর ভেঙে বন্যার বেগে আয় / আকাশ ভেঙে ঝঞ্ঝার বেগে আয়'। যা আমাদের অনেক দুঃখে গড়া ইতিহাস, নয় মাসের সে প্রামাণ্য দৃশ্যাবলিকে সিনেমা-ভেরিতে স্টাইল পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের শরীরে আলমগীর কবির গেঁথে দিয়েছেন, যে কাজটি করতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন (সাহা ৫৬-৫৭)।

চলচ্চিত্র সমালোচক আলমগীর কবির *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটির নির্মাণে প্রামাণ্য রীতি অনুসরণ করেন। *সিকোয়েন্স* পত্রিকায় এ ছবি সম্পর্কে উইলিয়াম অ্যাডামস লিখেছেন:

> The documentary style of its storytelling proved unpopular with a section of the audience. The narrative does away with the conventional story format and attempts to create a cinematic collage with the lives of characters who have all survived the ravages of 1971. Liberation War with still gaping wounds in their hearts. Although the film has been successful in establishing perhaps for the first time in Bangladesh, the style of time cinematic acting it will continue to remain a problems subject with the critics who have so far refrained from attempting its artistic evaluation. Musical scene is excellent, photography is good. (*সিকোয়েন্স*, সংখ্যা: ১, বর্ষ: ২, ঢাকা, ১৯৭৪)।

ধীরে বহে মেঘনা সমকালে দর্শক জনপ্রিয়তা পায়নি। প্রচলিত ব্যবসা সফল সিনেমার সূত্রানুযায়ী এটি ব্যবসা সফলতা লাভ করেনি। তবুও ছবিটি আলমগীর কবির নামক একজন নিরীক্ষাপ্রবণ পরিচালকের নবতর সিনেমাটিক ভাষা আর বিস্ময় আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপ। এতে একদিকে যেমন আছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ডকুমেন্টাশান, তেমনি আছে সেই সব ডকুমেন্ট বা প্রামাণ্য প্রকাশের এক ভিন্নধর্মী ফিকশান্যাল স্টাইল বা কাহিনি কথন রীতি। মুনাফা অর্জনের পরিমাপে বাংলা ছবির মূল্যায়নের যে মাপকাঠি তাতে চলচ্চিত্রটির দুর্বল অবস্থান দেখে হতাশ হননি পরিচালক (আক্তার ৮৬)। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দিককার চলচ্চিত্রগুলো সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও প্রামাণ্যধর্মী। এ ছবিতে মুক্তিযুদ্ধের মূল রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাপ্রবাহকে উপজীব্য করা হয়নি (মাসুদ ১৩২)। নির্মাতা আলমগীর কবির বলেন, বক্তব্য কিছু থাক বা না থাক, ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প একটি বিশেষ কারণে এখনও ১৯৪৭-পূর্ব কলকাতার স্টুডিও-ভিত্তিক বায়োস্কোপের রীতিনীতি দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত। তেমন অঙ্গনে সিনেমা ডিরেক্ট নিয়ে পরীক্ষা করতে যাওয়া অনেকটা জেনে শুনেই আঁাভা গার্দ জাতীয় সুইসাইড প্রচেষ্টার সামিল (সারওয়ার মুখবন্ধ অংশ)। তাই, বায়োস্কোপে নভেল জাতীয় গল্প বিস্তার দেখতে অভ্যস্ত এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-ফর্মের বিবর্তন সম্পর্কে অচেতন দর্শক, সমালোচক–উভয়েরই কাছেই ছবিটি (*ধীরে বহে মেঘনা*) দুর্বোধ্য রয়ে গেল (কবির, "অন্য চলচ্চিত্র" খ)। এ চলচ্চিত্রটি পরিচালক আলমগীর কবিরকে ব্যতিক্রমধর্মী পরিচালক হিসেবে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাচসাস পুরস্কার এনে দিয়েছিল (ইসলাম ১৫৯)।

উপসংহার

চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমটি জীবনের শিল্পিত উপস্থাপনের পাশাপাশি ইতিহাস-ঐতিহ্যেরও ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণীয় হলেও সেলুলয়েডেই সন্নিবেশিত হয় সময় ও বাস্তবতার ছবি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে গ্রথিত হয়েছে– সে অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে চলচ্চিত্র অন্যতম। স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস দৃশ্যায়নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলে একইসাথে ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিনোদন পাওয়া যায়। মুক্তিসংগ্রামের ভয়াল সময়ের চিত্র গ্রন্থপাঠে যতটা উপলব্ধি সম্ভব, তার অধিক প্রতিফলিত করা সম্ভব চলচ্চিত্র মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্মাতা আলমগীর কবিরের কলম, ক্যামেরা আর কণ্ঠ তিনই সক্রিয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সরাসরি অভিজ্ঞতা তাঁর মানসে রেখে গেছে তীব্র অভিঘাত। সেই অভিঘাতের সিনেমাটিক সাক্ষ্য বহন করে তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *ধীরে বহে মেঘনা*। চলচ্চিত্রটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যর্থ হলেও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প-এর মাধ্যমেই জরাজীর্ণ ও প্রচলিত ধারাকে ভেঙে শৈল্পিক মুক্তির পথে একধাপ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সত্যিকার ও ব্যাপক অর্থে চলচ্চিত্র ভাষা-প্রয়োগের নবতর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের প্রথমদিককার চলচ্চিত্র হিসেবে বিজয় উল্লাস-জাতীয় ভাবাবেগ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু *ধীরে বহে মেঘনা* চলচ্চিত্রটির তাৎপর্য এ তাৎক্ষণিকতার ঊর্ধ্বে উঠে গণহত্যা ও গণনির্যাতনের মানবিক দিক ও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষাই তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

হায়াৎ, অনুপম ।*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*। তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১১।

হায়াৎ, অনুপম। *আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*। বঙ্গজ প্রকাশন, ২০১৬।

আতিকুজ্জামান, আবুল খায়ের মোহাম্মদ ও প্রিয়ম প্রীতিম পাল (সম্পা.) । *চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি*। ১ম খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ২০১৮।

আলম, মোঃ মোরশেদুল। *চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন (১৯৭২-২০১৪ খ্রি.)*। ২০২০। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি থিসিস।

কবির, আলমগীর । "অন্য চলচ্চিত্র"। *মোহনা*। ভিন্টেজ প্রকাশনী, ১৯৮৪।

কবির, আলমগীর। "ধীরে বহে মেঘনা"। *চিত্রনাট্য ধীরে বহে মেঘনা, সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯।

বাংলাদেশের সিনেমার স্মরণীয় গান (১৯৫৬-২০১৬), আসলাম আহসান (সম্পা.), প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭।

ইসলাম, আহমেদ আমিনুল। *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: আর্থসামাজিক পটভূমি*। বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

হাসান, খন্দকার মাহমুদুল। *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র*। কথাপ্রকাশ, ২০১১।

মুৎসুদ্দী, চিন্ময়। *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আহমেদ, তারেক। *চলচ্চিত্রের চারিদিক*। কথাপ্রকাশ, ২০১৮।

মাসুদ, তারেক। *চলচ্চিত্রযাত্রা*। তৃতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩।

দাশগুপ্ত, ধীমান (সম্পা.) । *চলচ্চিত্রের অভিধান* । চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০১৪।

আক্তার, ফাহমিদা । *আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র*। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৯।

সারওয়ার, ফাহিম ইবনে ও সামি আল মেহেদী, *সিনেমার আলাপ*। কথাপ্রকাশ, ২০১৬।

কাদের, মির্জা তারেকুল। *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

হোসেন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ*। রোদেলা, ২০১৩।

আউয়াল, সাজেদুল। *চলচ্চিত্রচর্যা*। জার্নিম্যান বুক্স, ২০১৭।

সাহা, সুশীল (সম্পা.)। *বাংলাদেশের অন্য সিনেমা*। অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৩।

Kabir, Alamgir. *Film in Bangladesh*. Bangla Academy, 1979.